কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ......

ইউনিফর্মের আড়ালে পাহাড়সম দুঃখ

ওমর ফারুক ▷

ওদের ছবি দেখে কারো মনে হবে না, ইউনিফর্মের আড়ালে কত কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। ওরা প্রত্যেকেই দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাদের কারো বাবা রিকশাচালক, কারো মা বাসাবাড়িতে কাজ করেন। তাঁরা সন্তানের পড়াশোনার খরচ জোগাতে গিয়ে হিমশিম খাওয়ার কারণে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তাদের পড়াশোনার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল। কিন্তু কোনো সুযোগ মিলছিল না। এর মধ্যেই জাগো ফাউন্ডেশনের শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মকর্তারা খুঁজে বের করেন তাদের। সেই ছোটবেলা থেকেই জাগো ফাউন্ডেশন পড়াশোনার সব উপকরণসহ সব খরচ বহন করে তাদের পড়াশোনা করিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি ক্লাস ডিঙিয়ে তারা এখন দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তারা যতই ওপরের ক্লাসে উঠছে, ততই বড় হচ্ছে তাদের স্বপ্ন। এক শিক্ষার্থী জানাল, সে যখন স্কুলটিতে ভর্তি হতে পেরেছিল তখন স্বপ্ন ছিল গাড়িচালক হওয়ার। দশম শ্রেণিতে ওঠার পর এখন তার স্বপ্ন প্রকৌশলী হয়ে গাড়ি তৈরি করার।

জাগো ফাউন্ডেশন দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের খুঁজে বের করে পড়াশোনার আওতায় আনে। বিনা বেতনে পড়াশোনাসহ তাদের ইউনিফর্ম থেকে শুরু করে সব খরচ বহন করে জাগো ফাউন্ডেশন। ঢাকার রায়েরবাজার ও কড়াইল বস্তিতে রয়েছে তাদের স্কুল। এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের তারা পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে প্রথমে কেউ বুঝতেই পারবে না তারা দরিদ্র পরিবারের সন্তান।

সম্প্রতি রাজধানীর রায়েরবাজারে জাগো ফাউন্ডেশনে তাদের সঙ্গে কথা হয় কালের কণ্ঠ'র। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিল দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া ১৯ জন শিক্ষার্থী। তারা বলছিল, তাদের নিজেদের গল্প। তাদের জীবনের গল্প শুনে চোখ ভিজে আসছিল শ্রোতাদের। বরিশালের ভোলার বাপতা গ্রামের মানিক মিয়া ফরাজির মেয়ে ফাতেমা ফরাজি। তিন বোন দুই ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট সে। রায়েরবাজার এলাকার একটি বস্তি বাড়িতে বসবাস তার। বাবা মানিক মিয়া ফরাজি রিকশা চালিয়ে সংসার চালাতেন। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বাবা মারা যান। এর পর থেকেই তাদের কষ্টের শুরু। বন্ধ হয়ে যায় পড়াশোনা। পড়াশোনার প্রবল আগ্রহ হেরে যায় দারিদ্র্যের কাছে। আর তখনই জাগো ফাউন্ডেশন খুঁজে পায় তাকে। জাগো ফাউন্ডেশন তার পড়াশোনা ও ইউনিফর্মের সব খরচ বহন করে। আর তাদের রায়েরবাজারের স্কুলে বাংলা মিডিয়াম ইংরেজি ভার্সনে পড়ে আজ দশম শ্রেণির ছাত্রী সে।

ফাতেমা ফরাজি কালের কণ্ঠকে বলে, 'আমাকে জাগোতে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে চাকরি দেওয়া হয়। সে কারণে আমি পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারছি। বড় হয়ে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখি।'

কিশোরগঞ্জের ইটনা থানার শিমলা বড়হাটি গ্রামের মো. রুবেল জানায়, তাদের গ্রামের বাড়িতে জমিজমা ছিল। ভালোই চলছিল সংসার। কিন্তু তার বড় ভাই অসুস্থ হওয়ায় তাঁর চিকিৎসা করাতে গিয়ে সব শেষ হয়ে যায়। জীবন চালানোর জন্য মায়ের সঙ্গে সে ঢাকায় চলে আসে। তিন ভাই, দুই বোনের মধ্যে সে ছোট। বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। মা তাকে নিয়ে ঢাকায় এসে কাঁচামাল বিক্রি করেন। ২০০৭ সালে জাগোতে ভর্তি হয় সে। সেও আজ দশম শ্রেণির ছাত্র।

রুবেল বলে, 'আমাদের পরিবার খুবই দরিদ্র। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক আমার। কিন্তু গরিব হওয়ার কারণে পড়ালেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম। এর মধ্যেই ২০০৭ সালে জাগোতে ভর্তি হই।' পড়াশোনার পাশাপাশি সে শাহবাগের ফুলের মার্কেটে কাজ করছে। মাটিকাটা থেকে শুরু করে রিকশা পর্যন্ত চালিয়েছে সে। সামনে এসএসসি পরীক্ষা থাকায় কিছুদিন ধরে তার মা তাকে রিকশা চালাতে দিচ্ছেন না।

রুবেল কালের কণ্ঠকে জানায়, সামনে তার এসএসসি পরীক্ষা। এসএসসি পাস করে তার আরো পড়ার ইচ্ছা আছে। যতটুকু যাওয়া যায় ততটুকু যেতে চায় সে। এ পর্যন্ত পড়াশোনা করে তার তৃপ্তি অনেক। সবচেয়ে বড় তৃপ্তি মাকে বাংলা বর্ণমালা শেখাতে পেরে। জাগোর স্কুলে রেজাল্ট কার্ড নিতে আসে শিক্ষার্থীদের মা-বাবা। তাঁরা স্বাক্ষর করে রেজাল্ট কার্ড নেন। প্রত্যেকের মা স্বাক্ষর করতে পারেন। কিন্তু রুবেলের মা রেজাল্ট কার্ড নিতে এসে স্বাক্ষর করতে পারেননি। তিনি টিপসই দিয়ে কয়েক বছর আগে রেজাল্ট কার্ড নেন। সেটি দেখে রুবেলের কষ্ট হয়। ওই দিনই রুবেল সিদ্ধান্ত নেয়, তার মাকে সে অ আ ক খ শেখাবে। বুড়ো বয়সে রুবেল মাকে সেই অক্ষর চেনাতে সক্ষম হয়। এখন তার মা রেজাল্ট কার্ড নিতে এসে আর টিপসই দেন না। রুবেল আরো বলে, 'আর কিছু না হোক সন্তান হয়ে মাকে স্বাক্ষর করাতে শেখাতে পেরেছি এটা আমার জীবনে বড় পাওয়া বলে মনে করি।'

রুবেল প্রসঙ্গে জাগোর এক কর্মকর্তা নদী রশীদ বলেন, 'রুবেল যখন ক্লাস ফোরে পড়ে তখন দেখতাম প্রায়ই ক্লাসে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে জানলাম সে রাতে একটি জুতার দোকানে কাজ করে। আর দিনে পড়তে আসে স্কুলে। একদিন সে ব্যাগ ফেরত দিতে এসে বলে, আর পড়াশোনা করবে না। গ্রামে চলে যাবে। তখন আমরা তাকে বললাম তোমাকে পড়তে হবে। বলো কী করলে তুমি পড়াশোনা করতে পারবে। তোমাকে আমরা চালাব। মাসে কত টাকা দিতে হবে।' রুবেল তখন বলে, 'একবেলা খাবার পেলেই চলবে। আমার এর চেয়ে বেশি কিছু লাগবে না। এই কর্মী যখন বলছিল রুবেলের জীবনসংগ্রামের কথা, তখন উপস্থিত সবার চোখ ছলছল।'

আরেক শিক্ষার্থী আসিফা আলম অপি। থাকে রায়েরবাজার এলাকায়ই। সেও জাগো স্কুলের একজন শিক্ষার্থী। সে জানায়, তাদের পরিবার দরিদ্র। আর্থিক সহযোগিতা করার কেউ নেই। জাগো স্কুলের কারণে সে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে। জাগো স্কুলে ভালো মানের পড়াশোনার কারণে বাইরে কোচিং করতে হয় না।